দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ • ৩ য় সংখ্যা • ২০ মে ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা - ২
- মোদি কি এবার হেরে যেতে পারেন - ৩
- মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে মোদীর মিথ্যা প্রচারের জবাবে - ৫
- পরিবেশ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ - ৭
- অমর উনিশের শহিদ স্মরণে - ৯
- মণিপুরে জাতি দাঙ্গার এক বছর পূর্ণ হোল - ১০
- সুন্দরবনে প্রান্তিক মানুষের জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব - ১২
- চেনা মুর্শিদাবাদে অচেনা ভোট - ১৪
- মুক্তি পেল গণতন্ত্রের দুই কণ্ঠস্বর - ১৬
- তৃতীয় ও চতুর্থ দফার ভোটের গতিপ্রকৃতি - ১৭
- ইসরায়েল-বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ বিশ্বব্যাপী - ১৮

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের পতন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে চলেছেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, মূলত মুসলমানরা। কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিকৃত ভাষ্য তৈরি করে মোদী এই বিদ্বেষ প্রচার করছেন। উদ্দেশ্য সমাজে ধর্মীয় মেরুকরণ সৃষ্টি করা। নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক। প্রধানমন্ত্রী ভাল করেই জানেন তিনি যা করছেন তা দেশের সংবিধানে গৃহীত ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী। এই জন্যই মোদী গত ১৪ মে মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'তিনি যদি হিন্দু-মুসলমান বিভাজন করেন তাহলে তিনি জনজীবনে থাকার অধিকার হারাবেন।' ইতিপূর্বে মোদী বলেছেন, কংগ্রেস হিন্দু মহিলাদের সঞ্চিত সোনা, মঙ্গল সূত্র কেড়ে নিয়ে যাদের বেশী সন্তান তাদের দিয়ে দেবে বলেছে। তিনি নাকি বেশী সন্তান বলতে গরীব মানুষদের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাদেরই বেশী সন্তান হয়। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে মুসলিম বিরোধী হিসেবে প্রচার করে ওই সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো হচ্ছে, মুসলিম ভোট ব্যাংক তৈরি করার জন্য। এই ধরনের হাস্যকর ব্যাখ্যা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর থেকেই মোদী ও তাঁর দল আবারও মুসলমানদের আক্রমণ শুরু করেন। মোদী তাঁর গত ১০ বছরের রাজত্বে কখনও সাংবাদিক সম্মেলন করেননি। এখন নির্বাচনের সামনে এসে মোদী তাঁর পছন্দের সংবাদ মাধ্যমকে অকাতরে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। এগুলো আদৌ সাংবাদিক সম্মেলন নয়। কিছু নির্বাচিত প্রশ্ন ও তার উত্তরে মোদীর ভাষণ। পাল্টা প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ বা অধিকার ওই সুবোধ সাংবাদিকদের নেই। এই সব সংবাদ মাধ্যমের মালিকরা সকলেই প্রায় ক্রনি ক্যাপিটালিস্ট অর্থাৎ বশংবদ পুঁজিপতি। সাংবাদিকতার ন্যূণ্যতম নীতি এঁরা মানেন না। নিয়ম মেনে প্রধান বিরোধী দলের নেতার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সাহস এদের নেই। মোদীর ভারতে নির্বাচন কমিশন ও গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের মহান পতন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

Scanned with OKEN Scanner

নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা

শুভাশিস মজুমদার

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কয়েকটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি - বিরোধী প্রার্থীদের প্রত্যাহার করানো এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের বেশ কিছুদিন বাদে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সহকারে ভোটের হার জানানো পরে সেই প্রশ্ন আরো জোরালো হয়েছে।

প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ দিনে গুজরাটের সুরাটে কংগ্রেস প্রার্থী সহ বিজেপি বাদে অন্যান্য সকল প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দেশজুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। কোনরকম অনুসন্ধান ছাড়া নির্বাচন কমিশন সেই দিনই তড়িঘড়ি বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করে। ইন্দোরে কংগ্রেসের প্রার্থী অক্ষয় কান্তি বাম ২৯ এপ্রিল, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে আসেন এবং বিজেপিতে যোগ দেন। বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় হাসিমুখে অক্ষয় কান্তি বামকে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন এই ছবি সমাজ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সুমিত্রা মহাজন এই নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। অমিত শাহের কেন্দ্র গান্ধীনগরেও বিজেপি-বিরোধী প্রার্থীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ওড়িশার পুরী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সুচরিতা মহন্তি আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্রে একসঙ্গে ৩৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বারাণসী আসন থেকে কৌতুক অভিনেতা শ্যাম রঙ্গেলা সহ ৩৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী হিসাবে তৃতীয় মেয়াদের জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছেন। কৌতুক অভিনেতা শ্যাম রঙ্গেলা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নকল (মিমিক্রি) করার ভিডিওগুলির জন্য পরিচিত। তিনি ভিডিও জারি করে অভিযোগ করেছেন যে প্রথমে তাঁকে মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং পরে জমা দেয়ার সময়ও হেনস্থা করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে আইনজীবী অভিযোগ করেছেন যে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় আইন অনুযায়ী জেলাশাসক প্রার্থীকে শপথ গ্রহণ করাবেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও জেলাশাসক তাঁকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শপথ গ্রহণ করাননি। পরে শপথ গ্রহণ করা হয়নি এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। একই কারণ দেখিয়ে আরো অনেকের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। শ্যাম রঙ্গেলা অভিযোগ করেছেন, জেলাশাসকের অফিসে পুলিশ এবং বিজেপির কর্মীরা তাঁর এবং তাঁর সাথীদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। তাঁর সাথীদের মারা হয় বলেও অভিযোগ জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে। লোকসভা ভোট শুরুর ১১ দিন পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার ভোটের চূড়ান্ত শতকরা হার প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সাধারণত ভোট শেষ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভোটের হার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই বছরই প্রথম ব্যতিক্রম। ১৯ এপ্রিল ভোট শেষ হওয়ার পরে নির্বাচন কমিশন ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছিল। ১১ দিন বাদে, ৩০ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন সেই ভোটের হার ৬৬.১৪ শতাংশ (চূড়ান্ত) বলে জানিয়েছে। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে ভোটের হার ৬০.৯৬ শতাংশ বলে জানানো হয়েছিল। ৪ দিন বাদে, ৩০ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ভোটের হার ৬৬.৭১ শতাংশ বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। একদিকে দীর্ঘ বিলম্বে চূড়ান্ত ভাবে ভোটের হার জানানো এবং অন্যদিকে ৬ % হারে ভোট বৃদ্ধি, যুগপৎ বিস্ময় এবং সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছে। এই ঘটনা নজিরবিহীন।

প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্র এবং তার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে নথিভূক্ত ভোটারের সংখ্যাও আর কমিশনের ওয়েবসাইটে মিলছে না বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তাঁদের অভিযোগ, মোদী সংসদে আইন বদলে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত করে 'নিজেদের আম্পায়ার' বসিয়ে খুশি মতো নির্বাচন পরিচালনা করাচ্ছে। অতি সম্প্রতি

Scanned with OKEN Scanner

সংসদে আইন বদলে মোদী নির্বাচন কমিশনের নির্বাচক মন্ডলী থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে কেন্দ্রের কোন একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিন সদস্যের এই নির্বাচকমণ্ডলীতে মোদী নিজে, একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার এবং প্রধান বিরোধী দলের নেতা সদস্য হিসেবে আছেন। স্বভাবতই সংখ্যাধিক্যের জোরে ইলেকশন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল সবসময়ই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই থাকবে, ধরে নেওয়া যায়।

কংগ্রেস তথা বিরোধীদলগুলির নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যগুলি নিয়ে নির্বাচন কমিশন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। মোদী ঈশ্বরের নামে ভোট চেয়েছেন এবং রাজস্থানে (গত ২১ এপ্রিল) ও উত্তরপ্রদেশে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন বলে সুপ্রীম কোর্টে সম্প্রতি আর্জি জানানো হয়। সুপ্রীম কোর্ট ওই আর্জি খারিজ করে আবেদনকারীদের নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর নির্দেশ দেয়। যদিও নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা (প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে) নিয়েই অনেক অভিযোগ উঠেছে।

মোদি কি এবার হেরে যেতে পারেন

শশী থারুর

ভারতের নির্বাচন নিয়ে কিছুদিন আগেও ব্যাপকভাবে যে ধারণা ছিল, নির্বাচন দ্বিতীয় মাসে গড়াতে না গড়াতে সেই ধারণা ভেঙে পড়েছে।

আত্মতুষ্টিতে বুঁদ হয়ে থাকা পণ্ডিতেরা অনেক আগেই রায় দিয়ে রেখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অতি স্বাচ্ছন্দ্যে জিতে যাবে। কিন্তু সাত ধাপের নির্বাচনের মধ্যে দুটি ধাপের প্রায় ১৯০টি আসনের ভোট গ্রহণের পর মনে হচ্ছে, বিজেপির হাতে জয় যতটা সহজে ধরা দেবে বলে ভাবা হচ্ছিল, সেটি ততটা সহজে বোধ হয় আর হচ্ছে না।

ভারতের স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশন (ইসি) সাতটি ধাপের সব কটি আসনে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ধরনের আগাম জরিপের ফল প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। (আগামী ১ জুন ভোট গ্রহণ শেষ হবে এবং ৪ জুন ফলাফল ঘোষণা করা হবে)।

তবে ভোটারদের মনোভাব ও গতিপ্রকৃতির অনানুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ যে জোরালো ইঙ্গিত দিচ্ছে, তা মোটেও বিজেপির পক্ষে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, বিজেপিকে তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় আনার পক্ষে দলটি ভোটারদের তেমন কোনো জুতসই যুক্তি দেখাতে পারেনি।

মোদি নতুন চাকরির বাজার সৃষ্টি করবেন বলে জনগণকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এলে তিনি পূরণ করতে পারবেন;এমন আশা থেকে ২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালেও যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের আবার মোদিকে ভোট দেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

সত্যিটা হলো, মোদির আমলে বেকারত্ব তো কমেইনি; বরং তা মারাত্মকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। সম্প্রতি বেকারত্বের পারদ কিছুটা পড়তির দিকে বলে মনে হলেও এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সরকারি খাতাপত্রে বেকারত্বের যে হিসাব দেখানো হচ্ছে, আদতে তা তার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রকৃত অবস্থা হলো, ২০১৪ সাল থেকে ভারতের ৮০ শতাংশ লোকের আয় কমতির দিকে রয়েছে। এসব লোকের জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা এবং সঞ্চয় করার ক্ষমতা দুটিই ধসে গেছে। অনেকেই জনকল্যাণকে ঠিকমতো সুরক্ষা দিতে না পারার জন্য সরকারকে দায়ী করে আসছেন। কিন্তু তারপরও নিশ্চিতভাবে মোদি তাঁর ব্যক্তিগত ইমেজ দিয়ে কট্টর ভক্তদের নিয়ে যে গোষ্ঠীকে দাঁড় করিয়েছেন, তাদের সুবাদে তিনি এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা উপভোগ করছেন।

ব্যক্তি মোদির জনপ্রিয়তায় ভাটা না পড়লেও তাঁর দলের প্রার্থীরা ততটা জনপ্রিয় নন। বিজেপির প্রার্থীরা ভোটারদের সরাসরি অবজ্ঞার মুখে না পড়লেও একধরনের প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মুখে যে পড়ছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

মোদির আচরণ ও হাবভাবে তাঁর ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি তাঁর মুসলিমবিরোধী

Scanned with OKEN Scanner

হাঁকডাক থেকে বেরিয়ে এখন সরাসরি আক্রমণের দিকে চলে গেছেন। তিনি বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টিকে নিশানা করে তোপ দাগতে শুরু করেছেন।

মোদি বলেছেন, কংগ্রেস পার্টির ইশতেহারে 'মুসলিম লিগের সিল লাগানো আছে'। গত মাসে একটি নির্বাচনী প্রচারণা সভায় মোদি কোনো রকম রাখঢাক না করেই বলেছেন, কংগ্রেস পার্টি সরকার গঠন করলে সেই সরকার হিন্দুদের জমিজমা, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবে।

কংগ্রেস পার্টির ইশতেহারে না 'মুসলিম' না 'ভাগ-বাঁটোয়ারা'; এ দুটির কোনো একটি শব্দ না থাকার পরও তিনি কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানের নির্জলা অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। মোদি মুসলমানদের ভারতীয় না বলে 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করা লোক' বলে অপমান করেছেন।

এ ধরনের চরম উসকানি দেওয়া বক্তৃতা তাঁর পদ-পদবির জন্য অবমাননাকর। একজন প্রধানমন্ত্রীর সারা দেশের সব নাগরিকের সেবক হওয়ার কথা থাকলেও মোদি খুল্লামখুল্লাভাবে ভারতের ২০ কোটি নাগরিককে অবজ্ঞা করেছেন। বিজেপির অন্যান্য নেতাও একই ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়েছেন। যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপি যদি হেরে যায়, তাহলে ভারতে শরিয়াহ আইন চালু হয়ে যাবে।

এ ধরনের উগ্র ও চরমপন্থী বক্তৃতাবাজির পরও সেগুলোকে খুব কমই আশ্চর্যজনক বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, কমবেশি সবাই জানে, ধর্মের ভিত্তিতে ভোটারদের ভাগ করে ফেলার চেষ্টা বিজেপির একটি পরীক্ষিত কৌশল।

তাদের যুক্তিটি খুব সহজ, মুসলমানদের ভয়ংকরভাবে উপস্থাপন করাটা ভারতের মোট হিন্দু জনগোষ্ঠীর (সংখ্যায় যাঁরা ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ) অর্ধেককেও যদি তাদের অন্যান্য পার্থক্য ভুলে বিজেপির শিবিরে একত্র করতে পারে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আরেকটি জয় তাদের ঝুলিতে পড়বে।

কিন্তু বিজেপির এই কৌশল যে একেবারে নিশ্চিত লক্ষ্যভেদী, তা কিন্তু নয়। সে কারণে তারা আরও কিছু কৌশল নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই তারা বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তারপর সেসব অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার কথা বলে তাঁদের বিজেপির ঘাটে নৌকা বাঁধতে বাধ্য করেছে।

গায়ে দুর্নীতির কালি লাগানো বিরোধী নেতাদের বিজেপির 'ওয়াশিং মেশিনে' ঢুকে একেবারে 'সাফ-সুতরো' হয়ে বের হওয়াটা এখন জাতীয় কৌতুকে পরিণত হয়েছে। বিকল্প হিসেবে বিজেপি ছোট ছোট দলকে নিয়ে জোট গড়ার প্রস্তাবও দিয়ে রেখেছে।

অন্ধ্র প্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি এসব দলের একটি। বছর কয়েক আগে লোকসভায় তারা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল এবং দলটির নেতা মোদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন আচমকা তাদের সব কসুর মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ওডিশায় বিজু জনতা দল এবং পশ্চিমের রাজ্য পাঞ্জাবের অকালি দলকে (এ দুটি দলই পূর্ববর্তী জোট গঠনের সময় বিজেপিকে পরিত্যাগ করেছিল) বিজেপির নিজের দিকে টানার চেষ্টা খুব কমই সফল হয়েছে। দুটি দলই বিজেপির অনুরোধ ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তবে কোনো দলকে কবজায় নেওয়ার ক্ষেত্রে যখন প্ররোচনা ও সহযোগিতা দেওয়ার লোভ কাজ করে না, তখন বিজেপি সরাসরি ভয় দেখানোর পথে হাঁটে।

দিল্লি ও পাঞ্জাবের বিধানসভা দখলে রাখা আম আদমি পার্টির ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে। দলটির প্রধান ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে রাজি না হওয়ায় একটি মামলায় আসামি বানিয়ে তাঁকে রাতারাতি ধরে নিয়ে গারদে পুরে দেওয়া হয়েছে। কেজরিওয়ালের ডেপুটিকে কোনো রকম অভিযোগ ছাড়াই প্রায় এক বছর কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে।

কংগ্রেসের সঙ্গেও একই ধরনের আগ্রাসী আচরণ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতেই দলটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো জব্দ করা হয়েছে। একটি লুটের মামলার

অনুসন্ধান কাজের অংশ হিসেবে গত মাসেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এগুলো ব্যাপক জনসমর্থনপুষ্ট একটি আত্মবিশ্বাসী দলের কাজ-কারবার হতে পারে না। বরং এসব এমন একটি দলের কাজ, যাদের মনে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ার ভয় প্রবলভাবে কাজ করে।

বিজেপি ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ছয়টি রাজ্যে সব কটি আসনে জিতেছিল। একটি বাদে সব কটি আসনে তাদের জয় হয়েছিল তিনটি রাজ্যে। দুটি বাদে সব কটি আসনে জয় পেয়েছিল দুটি রাজ্যে। এসব রাজ্যে বিজেপির গমনপথ একটাই, আর সেটি হলো; পতন। এসব রাজ্যের প্রতিটিতে যদি বিজেপি হাতে গোনা আসনও হারায়; অর্থাৎ সব মিলিয়ে মাত্র ৩২টি আসন যদি তাদের হাতছাড়া হয়, তাহলেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে।

আর এমনটি ঘটার জোরালো সম্ভাবনা আসলেই আছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনের মাস কয়েক আগে পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন জইশ-ই-মুহাম্মদ জম্মু,কাশ্মীরে একটি সামরিক বহরে হামলা চালানোর পর সেই ঘটনাকে ভোট টানার ক্ষেত্রে বিজেপি কাজে লাগিয়েছিল।

সেই ঘটনা তখন বিজেপির ভোট বাড়াতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনে ভোটারদের আচ্ছন্ন করার মতো সে ধরনের কোনো ঘটনা নেই। সে কারণে বিজেপি আগেরবারের মতো ফল আশা করতে পারছে না।

এবারকার ভোটে জনসাধারণের সামনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের যথেষ্ট নজির আছে। অন্যদিকে বিরোধীরা নতুন আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়েছে। ফলে বাতাসে এখন পরিবর্তনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'প্রথম আলো' (৮ মে ২০২৪) থেকে পুনর্মুদ্রিত। অনুবাদ সারফুদ্দিন আহমেদ

মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে মোদীর মিথ্যা প্রচারের জবাবে

মিলন দত্ত

এবারের নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র কখনও 'মুসলমান' শব্দটা উচ্চারণ করেন না। তারপরও তিনি মুসলিমদের চরম অবমাননা, উপহাস ও আক্রমণ করতে সিদ্ধহস্ত। ২০০২ সালে মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভয়ংকর দাঙ্গায় গুজরাটে হাজারো মুসলমান ঘরবাড়ি হারায়। উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ওই সময় মুসলমানদের শিবিরগুলো একে একে গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করে মোদীর গুজরাট সরকার। দেশ-বিদেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। মোদী কটাক্ষ করে বলেছিলেন, তিনি 'শিশু উৎপাদনকারী কারখানা' চালু রাখার অনুমতি দিতে পারেন না।

এবার তৃতীয় দফার ভোটের আগে রাজস্থানের বক্তব্যেও মোদি মুসলমানদের 'যাঁরা অধিক সন্তান জন্ম দেন' ও 'অনুপ্রবেশকারী' বলে কটাক্ষ করেছেন। হিন্দুত্ববাদীদের এটাই প্রচার, মোদী সেই লাইনই মেনে চলেন; ভারতীয় মুসলমানরা বাইরে থেকে এসেছে। এখন তারা অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টটা একবার খতিয়ে দেখে প্রকৃত সত্যটা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। কারণ বিজেপি সরকার তারপরে আর কোনও জনগণনা করার চেষ্টা করেনি। তাহলে এই মিথ্যেগুলো আর বলা যাবে না।

একটা সত্য প্রথমেই জেনে নেওয়া ভাল যে, জনগণনা রিপোর্টে দেখা গেছে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২১.৫ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৭.৭ শতাংশ। ১৯৮১ থেকে এই প্রবৃদ্ধি হারের এই নিম্নগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অনেক বিশেষজ্ঞের হিসেব নিকেশ গোলমাল করে দিয়েছে। এর অর্থ হল ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল হতে যত সময় লাগবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেছেন তার আগেই তা

Scanned with OKEN Scanner

সম্ভব হবে। অন্য দিকে দেশের মোট মুসলিম জনসংখ্যা ১৩.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪.২ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের দশকের থেকে অনেকটাই কম। বস্তুত হিন্দুদের বৃদ্ধির হারের থেকেও কম। বিগত কয়েক দশক ধরেই হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেক বেশি। তার একটা কারণ হল মুসলিম সম্প্রদায়ে গড় বয়স সবচেয়ে কম ফলে তাদের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি। ২০১০ সালের হিসেব মতো ভারতে মুসলিমদের গড় বয়স ছিল ২২ বছর। সেই তুলনায় হিন্দু (২৬) এবং খ্রিস্টানদের (২৮) বেশ খানিকটা বেশি। মুসলমান মহিলাদের মাথাপিছু গড় সন্তানের সংখ্যা ৩.১ আর হিন্দুদের ২.৭ এবং খ্রিস্টানদের ২.৩ টা। মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে এগুলোকেই দেখা হয়ে থাকে।

২০০১ সালে এদেশে হিন্দু ছিল ৮০.৫ শতাংশ, ২০১১-য় সেটা কমে হয়েছে ৭৯.৮ শতাংশ। বলাই বাহুল্য গত এক দশকে হিন্দু জনসংখ্যা বদ্ধির হারও খানিক কমেছে; ২০০১ সালে ছিল ২০.৩ শতাংশ, ২০১১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৬.৮ শতাংশ। সেই তুলনায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিরর অনেকটাই বেশি; ২০০১-এ ছিল ২৯.৬ শতাংশ ২০১১-য় তা কমে হয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃধির হার কমে যাওয়ার হিসেব কষলে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের বৃদ্ধি যে হারে কমেছে তার চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি হারেও কমেছে মুসলমানদের জনসংখ্যা। প্রবৃদ্ধির হারে হিন্দুর থেকে বেশি হারে এই ইতিবাচক হ্রাস একটানা চলছে ১৯৮১-র জনগণনা থেকে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১; এই দশ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩২.৯ শতাংশ, ১৯৯১-২০০১ দশকে তা হয় ২৯.৩ শতাংশ, ২০০১-২০১১ দশকে সেটা হয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। এই ভাবে কমতে থাকলে অচিরেই মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হিন্দুদের সমান হয়ে যাবে। সাচার কমিটির সদস্য-সচিব আবুসাহ্ শরিফ বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও যে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিম্নমুখী হয়েছে, তাতে বোঝা এটা তাঁদের স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রবণতাকে আর বদলে ফেলা যাবে না।'

আবার নারী-পুরুষের হারের দিক থেকেও মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রকম উন্নতি করেছে। ২০১১-এর জনগণনায় দেশে নারী-পুরুষের হারের গড় দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪৩। হিন্দুদের মধ্যে ৯৩৯ আর মুসলমানদের মধ্যে ৯৫১। ২০০১সালে মুসলমানদের মধ্যে ওই অনুপাত ছিল হার পুরুষে ৯৩৬ জন নারী। আবুসাহ্ শরিফ মনে করেন, 'অধিক সন্তান জন্মানোর এটাও একটা কারণ হতে পারে।' কিন্তু ওই জনগণনা রিপোর্ট অনেকগুলো সত্যকে সামনে এনে দিয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে নিম্নমুখী সেটা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য গত দুটো জনগণনা রিপোর্টেও এই নিম্নগতির ধারা অব্যাহত ছিল। তারপরেও অপপ্রচারে ভাটা পড়েনি। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেন নিম্নমুখী তা নানা দিক থেকে আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করেছি। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভূত ঘাটতি থাকলেও গ্রামাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের প্রবণতা অনেকটাই বেড়েছে। হাসপাতালে বা নার্সিংহোমের মতো প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রসুতির ওপর একটা সামাজিক এবং পারিপার্শিক চাপ তৈরি হয়। এ রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব এখন ৯৫ শতাংশেরও বেশি। ইউপিএ সরকারের আমলে চালু করা 'জননী সুরক্ষা যোজনা' জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পর থেকে গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রকম বেড়েছে। এছাড়া প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পরে বন্ধাকরণ করিয়ে নেওয়ার যে সুযোগ, সেটাও গ্রহণ করছেন বহু মুসলমান বধূ। পরিবার পরিকল্পনার প্রায় কোনও সরকারি উদ্যোগ না থাকলেও স্রেফ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত আগ্রহে এগুলো ঘটছে।

নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, যাঁরা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা দুর্গাপূজা করেন তাঁরা শরণার্থী, আর যাঁরা করেন না তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। অর্থাৎ, অনুপ্রবেশকারী মানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

Scanned with OKEN Scanner

পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যায় কোনও মৌলিক তারতম্য দেখা যায়নি। বিপুল সংখ্যায় অনুপ্রবেশকারী রাজ্যে প্রবেশ সেই তারতম্য দেখা যেত। রাজ্যের জেলাওয়াড়ি হিসেব দেখলেই অনুপ্রবেশের তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনও নির্দিষ্ট একটি প্রবণতা নেই। উত্তর দিনাজপুরে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের গড়ের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি, সেখানে আবার নদিয়ায় তা প্রায় ৪ শতাংশ কম, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭.৫ শতাংশ কম। যে জেলায় মুসলমানদের বৃদ্ধির হার রাজ্য গড়ের তুলনায় বেশি, সেখানে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেমন, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইত্যাদি। আবার, যেখানে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার এই সম্প্রদায়ের রাজ্য গড়ের তুলনায় কম, সেই জেলাগুলিতে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরুলিয়ার মতো জেলাও রয়েছে যা সীমান্তবর্তী জেলা না হওয়া সত্ত্বেও এই জেলাতে মুসলমান ও হিন্দু উভয়েরই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিজ নিজ রাজ্য গড়ের তুলনায় বেশি।

সীমান্তবর্তী জেলাগুলি অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে বলে যে প্রচার তার কোনও সারবত্তা নেই, কারণ ওই জেলাগুলোতে কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিকে কোনও নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যাচ্ছে না। আবার ধার্মিক পরিচয়ের তুলনায় অন্য কয়েকটি সূচক অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, যে জেলাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বৃদ্ধির হার রাজ্যে গড়ের তুলনায় অনেকটা বেশি, সেই জেলাগুলির স্বাক্ষরতার হার অন্য জেলাগুলির তুলনায় অনেক কম। স্বাক্ষরতার নিরিখে উত্তর দিনাজপুরের স্থান সবার নীচে, তার ঠিক উপরেই রয়েছে মালদা, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ। আবার তুলনামূলক ভাবে এগিয়ে থাকা জেলা যেমন কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলি বা উত্তর ২৪ পরগনা উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার রাজ্যের গড়ের থেকে কম। স্বাক্ষরতার নিরিখেও এই জেলাগুলির স্থান অনেক উপরে। তাহলে মোদীর বা তাঁর তাত্বিক গুরু আরএসএস-এর মুসলিম বিরোধী কোনও প্রচারই তথ্যের নিরিখে ধোপে টিকছে না। তবু মানুষ যাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে খারাপ প্রচার শুনতে চান বা শুনতে ভালবাসেন তাঁর নিশ্চয়ই মোদীজির বক্তৃতা শুনে খুশি হচ্ছেন। মিথ্যে বলে অনেকদিন পাড় পাওয়া যায় চিরদিন তা চলে না। ৪ জন লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরলেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে, বিশ্বাস করি।

পরিবেশ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

মানুষ যেমন হয়েছে তেমন নয়, মানুষ যেমন হতে পারত তেমন এক আদল রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন প্রায় সমস্ত জীবন ধরে। মানুষের চারপাশটা যেমন আছে তেমন নয়, যেমন হলে হতে পারত মানুষের পূর্ণতার বিকাশ, সেই এক ছবির বুনন তৈরি করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত।

'জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে' প্রকৃতির সাথে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, বিচ্ছেদ বেড়ে চলে। পরিবেশ বিপর্যয়ে, জীবনযাত্রা রচনার গুরুত্ব যথেষ্টই। এই সব প্রসঙ্গ আবার নতুন করে তাই ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার বিস্তর ফারাক প্রকৃতি থেকে মানুষকে আরও বিচ্ছিন্ন করে চলেছে। নানান আর্থ - সামাজিক বৈষম্যের মতন বড়ো ব্যাধির সৃষ্টি করে চলেছে। সামগ্রিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রশ্নে নগর ও গ্রামের সত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দিকটি আজ গভীর চর্চার বিষয়।

বর্তমান কালের পরিবেশ বিপর্যয়ের মাঝে গোটা বিশ্ব জুড়েই পরিবেশ সহায়ক মানবিক বাসভূমি নির্মাণের প্রসঙ্গই বারে বারে উঠেছে। সংগত কারণেই ভয়াবহ বায়ুদূষণ, জলদূষণ, বর্জ্য নিক্ষেপণ, শব্দদূষণ, দৃশ্যদূষণ প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিগত পরিকল্পনার পাশাপাশি মানব আচরণের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়েও আলোড়ন উঠেছে।

Scanned with OKEN Scanner

মানবিক, আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশবান্ধব নির্মাণ ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বর্তমান পরিবেশ সংকটে মানব অস্তিত্বের বিপন্নতার মাঝে ১৯১৬তে 'জাপান যাত্রী'-র অভিজ্ঞতাটি হয়তো আর নিছকই একটি ডায়রি থাকে না, দেখা দেয় সতর্কবার্তার প্রত্যক্ষ স্তম্ভ-রূপে। নদীপথে যেতে যেতে ১৯১৬ সালে 'জাপান যাত্রী'-তে, শহর ও তার কাছের নদী ও মানুষের নিত্য সম্বন্ধের মতোন অত্যন্ত জরুরি দিকগুলির প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন,; '...পৃথিবীতে যেসব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্য-লক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস সরোবরের সৌন্দর্য শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়, যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল, তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।'

কত অব্যর্থ সত্য দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎকে দেখেছিলেন। আমরা শহরবাসীরা অমন সুন্দর গঙ্গা নদী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। শহর পিছনে ফেলে দিয়েছে তার আপন ঐতিহ্যকে। গঙ্গার পাড় দখলে, আবর্জনায় ত্রস্ত। আমাদের আজকের জীবনে গঙ্গা সংস্কৃতি তাই অনুপস্থিত।

সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলকাতা মহানগরীর পৌরবৃন্দের অভিবাদনের উত্তরে, ১৯৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ, বাসভূমির জনস্বাস্থ্য, জনস্বাচ্ছন্দ্য-ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। 'পৌরকল্যাণ সাধনে' শিল্প-শিক্ষা-সংস্কৃতির ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন নগরীর চরিত্র নির্মাণের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে। সেই দিন অল্প কথায় তিনি যে সারকথাগুলি বলেছিলেন, আজকের প্রযুক্তি-সংস্কৃতি চর্চায় আবারও সেই কথাগুলিকেই অপরিহার্য সমাধান সূত্র হিসাবে দেখতে হবে। 'খএই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্য আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক; ইহার প্রবর্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতিকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক,; পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণ সাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধ বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক; শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি, সকল ধর্ম সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক; এই কামনা করি।'

> " বাণিজ্য-লক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস সরোবরের সৌন্দর্য শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়, যন্ত্র তার বাহন। "

বাসস্থানের অধিকারভেদের মতন অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্নও তিনি তুলেছিলেন। বসবাসের যোগ্যতার প্রশ্নে, মানুষের আচরণের দিকটিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে লোকালয়ে, নগরে, গ্রামে গঞ্জে, আজ কি বিপুল প্রয়াসই না চালাতে হচ্ছে। Public Awareness নামক জন-সচেতনতা গড়ে তোলার বিশাল কর্মযজ্ঞের মূল কথাটাই হল সাধারণ মানুষকে আরো দায়িত্ববান করে তোলা। আশ্রয় নেবার ইচ্ছে থাকলেই শুধু হবে না, বাসস্থানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতাও অর্জন করা চাই। দায়িত্বপালনে যোগ্যতারও একটা প্রশ্ন থাকে, তা কুটিরেই হোক বা শহরে; সমানভাবে প্রযোয্য। বিশ্বব্যাপী জনজীবনে এখন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হচ্ছে।

(পরের সংখ্যায়)

Scanned with OKEN Scanner

অমর উনিশের শহিদ স্মরণে

নীতীশ বিশ্বাস

আসামের বাঙালিরা তাঁদের মাতৃভাষার অধিকার হরণের অসাংবিধানিক ফতোয়ার বিরুদ্ধে বরাকের বঙ্গভাষী মানুষ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। সেই আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৬১ সালের উনিশে মে, একদিনে ১১ জন প্রাণ দেন। তাঁরা বিশ্বের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বরাকবাসী এর ফলে অর্জন করেছিলেন তিনাটি জেলার জন্য শিক্ষা ও সার্বিক প্রশাসনে বাংলাভাষা ব্যবহারের অধিকার। ১৯ শের অমর শহিদদের সেই তালিকা হল ১. কমলা ভট্টাচার্য (১৬), ২. শচীন্দ্র পাল* (২০), ৩. সুনীল সরকার (১৫) ৪. বীরেন্দ্র সূত্রধর ৫. কানাইলাল নিয়োগী, ৬. সুকোমল পুরকায়স্থ ৭. চণ্ডীচরণ সূত্রধর, ৮. সত্যেন্দ্র দেব, ৯. হীতেশ বিশ্বাস, ১০. কুমুদরঞ্জন দাস, ১১. তরণী দেবনাথ। এই আন্দোলনে আহত হয়ে ২১ বছর যাবত যন্ত্রণাক্লিষ্টভাবে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করেন ১২ তম শহিদ কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস। এরপর যখন আবার মাতৃভাষা বাংলার ওপর আক্রমণ নেমে আসে এবং আসামের ফ্যাসিস্ত সরকার এইসব অধিকার কেড়ে নিতে নর্দেশনামা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে তার প্রতিরোধে উনিশে মে শহিদদের উত্তর পুরুষেরা প্রাণের বিনিময়ে প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন বার বার। সে অমর সেনানিরা হলেন ১৩ তম শহিদ বিজন চক্রবর্তী (বাচ্চু); করিমগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দেন ১৭ই আগস্ট ১৯৭২ সাল। তিনি ডিওয়াইএফ-ও এসএফআই-এর সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। এরপর ১৯৮৬ সালে ২১শে জুলাই শহিদ হন (১৪তম) দিব্যেন্দু দাস (যীশু) ও ১৫তম শহিদ জগন্ময় দেব। ঐ পর্বের শেষতম শহিদ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীভাষী সুদেষ্ণা সিংহ (১৯৯৬সালে)। নানা চক্রান্ত ও অবিচার চললেও বরাকে বাংলা ভাষার অধিকারের বিষয়টি কমবেশি এতোদিন প্রায় অক্ষুন্নই ছিল।

গত কয়েক বছর আসামে বিজেপির শাসন কায়েম হবার পর বাঙালিদের উপর আইনী পথে ভয়ংকর বে-আইনী ও অসংবিধানিক নানা পদক্ষেপ করছে তারা। নাগরিকপঞ্জির নামে প্রথমে ৪০ লক্ষ পরে ১৯ লক্ষ অনসমিয়া ভোটারকে (NRC) তালিকার বাইরে ঠেলে দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ঘোষণা করে। বিজেপি নাকি হিন্দুদের ত্রাতা কিন্তু এই বেনাগরিকদের মধ্যে ১৬ লক্ষই হিন্দু। এই ভায়ানক মিথ্যাচারী, অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক কাজের পক্ষে দাঁড়িয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারও। এমনকি তারা এখন সরকারের পূর্বে গৃহীত ভাষা আইনও অমান্য করে বরাকে অসমিয়া ভাষা পড়ানো চালু করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আন্দোলনকারীদেরকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। হচ্ছে আরো হবে।

অন্যদিকে নয়া শিক্ষানীতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার একক-ভাষার বুলডোজার চালাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বঙ্গভাষী ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ না করতে পারলে ভারতে বাংলাভাষী মানে বাংলাদেশী বলে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে। যার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত যোগীজির রাম রাজত্ব উত্তরপ্রদেশের পিলভিটের চার জন বাঙালি ডাক্তারকে এই ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে বাংলাভাষী বলে বাঙলাদেশী নামে জেলে পুরেছে। সেখানে আমাদের বন্ধুরা আইন-আদালত সাহায্য নিয়ে তাদের পাশে সাধ্যমত দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। আর এক্ষেত্রে হিন্দু না হয়ে আমাদের মুর্শিদাবাদ বা হুগলীর বাংলাভাষী ঘটি-মুসলমান হলে তো কথাই নেই অজস্র সহস্র তার অপরাধ। সে কি করেছে তা বড়ো কথা নয়, সেই নেকড়ের যুক্তির মাৎস্য ন্যায়ে ডুবন্ত ভারতীয় গণতন্ত্র।

এভাবে চললে আগামী শতাব্দীতে বাংলা ভাষা এদেশ থেকে হারিয়ে যাবে। যেমন হারিয়ে যাচ্ছে হিন্দি বলয় সহ আন্দামান (৭৩-৭৬ু বাঙালি) থেকে ঝাড়খণ্ড (৪২-৪৪ু বাংলাভাষী) পর্যন্ত নানা রাজ্যে। আর আসাম সহ গোটা উত্তরপূর্ব ভারতেতো জতুগৃহ দাহের মতো নিত্য চিতা বহ্নিমান। তার এই ভয় কলকাতার সমস্ত বাংলাভাষা সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা মাতৃভাষাপ্রেমী পশ্চিমবঙ্গবাসীকে

Scanned with OKEN Scanner

ডাক দিচ্ছে প্রতিবছর উনিশে মে ভারতে বাংলা ভাষার অধিকার সুরক্ষা দিবস হিসেবে পালনের। আপনাদেরকে অনুরোধ এই মাতৃমুক্তিপণে সামিল হোন।

বিজেপি চায় বাংলা সহ অন্য ভারতীয় ভাষাসংহার আপনাদের মন নবীনে থাকবে প্রথম মোদী সরকার সিংহাসনে বসেন ২৬শে জুন ২০১৪, তার পর দিনই প্রশাসনিক সভায় ঘোষণা করা হয় সব দপ্তরের কাজ কেবলমাত্র হিন্দিতে হবে। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং আর রাষ্ট্রমন্ত্রী রিজিজু। যেমন এবারের (২০২৩এর) ডেপুটি চেয়ারম্যান বিজেডি সাংসদ ভর্তৃহরি মহতাব সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে হিন্দির ব্যবহার মাত্র ২০-৩০ শতাংশ। হওয়া উচিত ১০০ শতাংশ। ইংরেজি বিদেশি ভাষা, ঔপনিবেশিক নীতি পরিত্যাগ করা দরকার। আগের বার চেষ্টাও হয় কিন্তু সেবারও তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভরত গর্জে ওঠে। তাই একটু পেছন ফিরে রাজনাথ সিং বলেন, কেবল গোবলয়ের রাজ্যের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে হিন্দি ব্যবহৃত হবে। মহান উনিশের রক্ত রঞ্জিত মহান শহিদ দিবসের পুণ্য লগ্নে আমরা মহান, উদার ও মানবিকতায় ঋদ্ধ ভাষা আন্দোলনে সকলকে সমবেত হবার আহবান জানাই।

মণিপুরে জাতি দাঙ্গার এক বছর পূর্ণ হোল

সৌর বসু

মনিপুর উপত্যকায় ২০২৩ সালে মে মাসে যে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয়েছিল তার এক বছর পূর্ণ হল সম্প্রতি। মে মাসের ৩ তারিখে জাতিগত দাঙ্গার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে গোটা মনিপুর উপত্যকা জুড়ে শান্তির অন্বেষায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা সভার আয়োজন করে মেইতেই এবং কুকি জো সম্প্রদায়ের মানুষজন। শান্তি ও সংহতির বার্তা নিয়ে সাইকেল মিছিল বার করা হয়। জাতি-সংঘর্ষের প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েকজন মহিলা মাথা কামিয়ে ফেলে। মহিলারা মনিপুরের ঐক্য ও অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্ল্যাকার্ড হাতে

গত এক বছরে কুকি জো সম্প্রদায় এবং মেইতেদের মধ্যে সংঘর্ষে মনিপুর উপত্যকা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সরকারি অস্ত্রাগার থেকে সাড়ে ছ'হাজার অস্ত্র, ৬০-৬৫ হাজার গোলাবারুদ লুট করা হয়। জাতিদাঙ্গায় প্রাণ হারান ২২৫-এর বেশি মানুষ। ধর্ষিত হন বহু মহিলা। ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বহু মানুষ পঙ্গু হয়। অনেকের আশ্রয় মেলে ত্রাণ শিবিরে। ত্রাণ শিবিরের দৈন্য দশা ,অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই বাস্তুহারারা থাকতে বাধ্য হয়। রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে দৃকপাত করেনি।

জাতি-সংঘর্ষের বর্ষপূর্তির দিন শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার আয়োজন ছিল। মেইতেই অধ্যুষিত ইম্ফল উপত্যকা এবং পার্বত্য এলাকা, যেখানে কুকি সম্প্রদায়ের বসবাস, এই দুই এলাকার সংযোগস্থলে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় শান্তি এখনও সুদূর পরাহত। বস্তুত পক্ষে উপত্যকা এবং পার্বত্য এলাকার সংযোগস্থলটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের চেহারা নেয়।

মণিপুরে মূলত মেইতেই, নাগা এবং কুকি জো জনগোষ্ঠীর বসবাস। মেইতেইরা বাস করে উপত্যকায় এবং তাদের জনসংখ্যা মণিপুরের মোট জনসংখ্যা ৫৩ শতাংশ। কুকি এবং নাগারা মূলত বসবাস করে পার্বত্য এলাকায়। কুকি এবং নাগাদের ৯০ শতাংশ খ্রিস্টান। মেইতেইদের বেশিরভাগ হিন্দু। এছাড়া কিছু মুসলমান এবং খ্রিস্টানও রয়েছে। মনিপুর রাজ্যটি উপত্যকা এবং পার্বত্য এলাকায় বিভক্ত। রাজ্যের ৯০ শতাংশ পার্বত্য এলাকা অবশিষ্ট ১০ শতাংশ উপত্যকা এলাকা। উপত্যকা এলাকায় মেইতেই জনগোষ্ঠীর বসবাস। মেইতেইদের বেশিরভাগ মানুষ অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত। কুকি এবং নাগা জনগোষ্ঠী তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত।

মনিপুরের মেইতেই জনগোষ্ঠী অনেকদিন ধরেই তপসিলি উপজাতি মর্যাদার জন্য আবেদন করে আসছে। ২০২৩ সালের মে মাসে মনিপুর হাইকোর্টের মেইতেইদের তপশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্তি করা নির্দেশ জন সমক্ষে

প্রকাশিত হবার পর কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মে মাসের ৩ তারিখে মনিপুরে 'All Tribal Students Union' মনিপুর হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করে। মেইতেই গোষ্ঠী ২ মে কুকিদের গ্রামে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পরের দিন কুকি ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মিছিলের উপর মেইতেই গোষ্ঠী আক্রমণ করে এবং মনিপুরের উপত্যকা অঞ্চলে, ইম্ফলের লাগোয়া কুকিদের বাড়ি ঘরে আগুন দেয়। এরপর থেকেই কুকি-মেইতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিংসাত্মক আকার ধারণ করে।

মনিপুরে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং মেইতেই গোষ্ঠীর মানুষ। বীরেন সিংয়ের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সংঘর্ষের সংয় তাঁর সরকার মেইতেইদের পক্ষ নেয়। বিদ্রোহ দমনের পরিবর্তে বিজেপি সরকার মণিপুরে বিদ্রোহের আগুন জিইয়ে রেখেছে, খৃষ্টান কুকি সম্প্রদায়কে কোন ঠাসা করে রাখার উদ্দেশ্যে। বীরেন সিংয়ের সরকারকে, মদত জুগিয়ে গেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। বিগত এক বছর ধরে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে মণিপুরে, ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চলেছে, প্রচুর প্রাণহানি হয়েছে, বিপুল পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয়েছে, সরকারি অস্ত্রাগার লুট হয়েছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ ব্যাপারে ৩ মিনিটের একটি বিবৃতি দিয়ে তার দায়িত্ব সেরেছে। তিনি মণিপুরে যাননি।

বিজেপি ভারতকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। হিন্দু ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষদের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করে। কুকিদের প্রতিও তাই বিজেপি সরকার একই কারণে বিরূপ আচরণ করছে। কুকিদের বহিরাগত বলে প্রচার চালাচ্ছে। রাজ্যের মাত্র দশ শতাংশ এলাকায় মেইতেই জনগোষ্ঠী বাস করে। সরকারি হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, এয়ারপোর্ট মনিপুরের উপত্যকা এলাকায় হওয়ার দরুন মেইতেইরা পার্বত্য এলাকার কুকি সম্প্রদায়ের থেকে সুযোগ-সুবিধা বেশি পায়। পার্বত্য এলাকায় চাষবাস করে কুকি জো গোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে। কুকিদের অভিযোগ, পার্বত্য অঞ্চলের অনেক এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। সেসব এলাকায় কুকিদের বসবাস বহুদিনের। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা হবার পর কুকিদের সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে উৎখাত করা হয়। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই কুকিরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মেইতেইদের আবার পার্বত্য এলাকায় জমি কেনার অধিকার নেই। মেইতেইদের তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। মনিপুরের মূল সমস্যা উপত্যকা অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে।

মনিপুরে এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন শান্তি ফেরানো। সম্প্রতি প্রাক্তন আই এস অফিসার হার্স মান্দারের সঙ্গে অধ্যাপক বিধান লাইসরাম এবং শান্তিকর্মী সেম হাওকিপের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। কথোপকথনের সময় উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানা যায় যে, জাতিগত সংঘর্ষ যে এত বড় আকার নিতে পারে সেটা তাদের ধারণা ছিল না। গত এক বছর ধরে এই সংঘর্ষ চলছে। কিন্তু রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা নেয়নি। লাইসরাম এবং সেম হাওকিপ যথাক্রমে কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের বক্তব্য, মনিপুরে গত দু'হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জাতি উপজাতি, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিদ্যমান।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছে। মণিপুরে বীরেন সিংয়ের সরকার ইন্ধন যুগিয়েছে। তৎসত্ত্বেও তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কথোপকথন চালানো যেতে পারে। কথোপকথনের মধ্যে দিয়েই শান্তি ফেরানো সম্ভব। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবে না বলেই তাদের বিশ্বাস। শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার ব্যর্থ হয়েছে। শান্তি স্থাপনের জন্য উভয় গোষ্ঠীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে উদ্যোগী হতে হবে।

Scanned with OKEN Scanner

সুন্দরবনে প্রান্তিক মানুষের জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব

নিরঞ্জন মন্ডল

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গর্ব এই ম্যানগ্রোভার চিরসিবুজ বনভুমি। সুন্দরবনের মোট ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে লোকবসতি শুরু হয়। এই আবাদী এলাকার উনিশটি ব্লকে শস্তায় জমির লোভে খুলনা সাতক্ষীরা এলাকার নিম্নবর্গের মানুষ বন কেটে বসতি গড়ে তোলে। রাঁচি ছোটনাগপুর থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাওতাল, মুন্ডা ওঁরাও, এদের নদীবাঁধ ও বনকাটার জন্য আনা হয়। বন্যায় বানভাসি হয়ে মেদিনীপুরের কিছু মানুষ এই এলাকায় চলে আসে। এই এলাকার একফসলী জমিতে ফসল হলেও এলাকার গরীব মানুষ জীবিকার জন্য সুন্দরবনের বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করতে হয়। এলাকার জেলে মৌলে বাউলে কাঠুরে, কাঁকড়ামারারা বাদাবনের কাঠ, মাছ, মধু,কাঁকড়া,এসব সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করত।তবে এ সব বনজ সম্পদের দাম তখন খুব কম ছিল। তবু জীবিকার প্রয়োজনে এদের বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে গিয়ে বাঘের মুখে জীবন হারাতে হত। জেলে মৌলেরা বনের বিপদ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য বনবিবি,দক্ষিণ্রায় আলিমদত এসব লোকদেবতার পূজা, হাজোত দিয়ে জঙ্গলে যেত। এদের সঙ্গী গুনিন বাউলে বিভিন্ন রকম মন্ত্রের দ্বারা বাঘ কুমীর বশীভুত করার চেষ্টা করা হত।

সুন্দরবনের দ্বীপগুলির অধিকাংশ ছিল অপরিণত বদ্বীপ।জোয়ার ভাটায় পলি পড়ে উচু হওয়ার আগেই বিট্রিশ সরকার রাজস্বের লোভে এ সব দ্বীপে বন কেটে বসত গড়ার পরিকল্পনা করে।আধুনিক গবেষণায় প্রমানিত সুন্দরবনে মোট ১৩৫টি দ্বীপ আছে। এর মধ্যে ১০০টিতে জঙ্গল, ৩৫টিতে মানুষের বসতি আছে। ১. সুন্দরবনের দ্বীপগুলির মানুষের বসতি গড়ে তোলার প্রাক শর্ত ছিল প্রতিটি দ্বীপের চারিদিকে নদী বাঁধ গড়ে তোলা। এই নদী বাঁধ হল এলাকার মানুষের জীবনরেখা। এখানকার নদীগুলিতে ২৪ ঘন্টায় দিনে দুবার জোয়ার দুবার ভাঁটা হয়। অমাবস্যার কোটালে জোয়ারের জল সর্ব্বোচ্ছ যে উচ্ছতায় উঠে দ্বীপের মানুষ সেই উচ্ছতা থেকে তিন ফুট নিচে বসবাস করে। এই ভঙ্গুর মাটির বাধের উপর ভরসা করে ঝুঁকি নিয়ে জীবন কাটাতে হয়। সুন্দরবন এলাকার প্রধান সমস্যা নদীবাঁধের ভাঙন। জোয়ারের জলে আসা পলি, নদীর প্লাবন ভুমি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় নদীগর্ভের একদিকে পলি জমা হয়। অন্যদিকে নদী বাঁধে প্রবল ভাঙন দেখা যায়। এজন্য নদীর সামনে জায়গা ছেড়ে পেছনে কৃষি জমিতে রিং বাঁধ দিয়ে ভাঙন রোখার চেষ্টা করা হয়।

সুন্দরবনের পুরনো ইতিহাস যতটা জানা যায় তার মধ্যে প্রকৃতিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক ঘটনা বার বার ঘটেছে। ভূমির অবনমন, ঘুর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূকম্পন, নদীজলের প্লাবনে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়েছে। ১৫৮২ সাল থেকে ২০২১সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সেই ধারা বজায় আছে। ১৬৮৮ সালে প্রবল ঝড় ও বন্যায় সাগরদ্বীপে যাট হাজারের অধিক লোক মারা যায়। ১৭৩৭ সালে প্রবল ভুমিকম্প ও ঝড়ে সুন্দরবনের প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওই সময় গঙ্গার জল চল্লিশ ফুট উঠেছিল। ১৮৬৭ সালের পয়লা নভেম্বরের প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোন ও জলচ্ছ্বাসে সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। নতুন তৈরী হওয়া ক্যানিং বন্দর, রেল স্টেশনের মালগুদাম, জেটিতে পুরাতন জাহজ ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাতে দূরে আছড়ে ফেলে। নোঙর করা জাহাজগুলিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৯৭৮ ও ১৯৮৮ সালের সাইক্লোনে এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ২০০৯ সালের আয়লায় ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এরপর ২০১৯ সালের বুলবুল, ২০২০ সালের আমফান, ২০২১ সালের ইয়াস, সুন্দরবনের প্রকৃতির রূদ্ররোষ আরও প্রবল গতিতে বাড়ছে। সুন্দরবনের ভূখন্ডের ভূমির অবনমন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সুন্দরবনের প্রাচীন প্রত্নস্থল ধোসা ও তিলপি পিয়ালি নদীর প্রবল প্লাবনে ও ভূমির অবনমনে এলাকার বৌদ্ধ বিহারের কাঠামো বারবার ধসে পড়েছিল।

Scanned with OKEN Scanner

এই ভাবে ধসে পড়ার কারণে এই স্থান 'ধোসা' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। এই সময়ের গবেষকরা বিশ্বউষ্ণায়নের প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন।

বিশ্বউষ্ণায়নের প্রভাবে সুন্দরবন এলাকার নদীনালা জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পরিবেশের তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে বরফের পাহাড় গলে সমুদ্রের জলের পরিমাণ বাড়ছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত সুন্দরবন এলাকায় জলের স্তর বাড়ছে বছরে ১২ মিলিমিটার। আবার মোহনায় জলের তাপমাত্রা ১২ বছরে ০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়ছে। সুন্দরবন এলাকার জলতল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নুনের মাত্রা বাড়ছে। এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমেছে। এভাবে জলজ প্রাণীরা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন এর সম্ভাবনা রয়েছে। নুনের মাত্রা বাড়ায় সুন্দরী গাছ গোলপাতা; এসব ম্যানগ্রোভের বংশবিস্তার ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের আকাঙ্খা মিষ্টি জলের সরবরাহ না বাড়ালে বাদাবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে।

সুন্দরবন ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়। এই সময় থেকে সুন্দরবনে নতুন নতুন পাকা রাস্তা তৈরীর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হতে থাকে। বিশ্বায়নের প্রভাবে এই সময় থেকে দেশি বিদেশি পর্যটকের আগমন বৃদ্ধি পায়। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর টুরিষ্ট লজ তৈরি হয় এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। বাদাবনের বাগদা, কাঁকড়া, বিদেশে রপ্তানির ফলে এসব বনজ সম্পদের দাম বেড়ে যায়। দ্বীপের চরে জোয়ারের সময় লাইলনের নেটজাল দিয়ে বাগদার পিন (পোনা) ধরে ফিশারীতে বিক্রী করে স্থানীয় মানুষের আয়ের পথ খুলে যায়। কাঁকড়ামারাদের আয়ও বেড়ে যায়। এভাবে বিশ্বায়নের কল্যাণে মানুষের দারিদ্র কিছুটা লাঘব হয়। তবে ২০০৯ সালে ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে এলাকার নদীবাঁধ ভেঙে ফসল, জীবন ও জীবিকার খুব ক্ষতি হয়।

এলাকার উন্নয়নের সাথে সাথে, গ্রামে সোলার ও পরে গ্রিডের বিদ্যুৎ এসে যায়। গ্রামে গ্রামে ফোর জি পরিসেবার উচু উচু টাওয়ার বসেছে। এভাবে গ্রাম-শহর বেতার ব্যবস্থায় জুড়ে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার দারুণ উন্নতি হয়েছে। আবার গ্রামে কাজ না মেলায় অগনিত গ্রামছাড়া শ্রমিক পরিবার ছেড়ে দেশের নগর, বন্দর জুড়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বায়নের প্রভাবে এভাবে সামাজিক জীবনে ভাঙন প্রকট হয়।

আয়লায় গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে দারুন ক্ষতির পর এলাকার মানুষ জীবিকার তাগিদে অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু দিল্লী; এসব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠায়। সুন্দরবন এলাকায় গ্রামে এখন আর পুকুর কাটতে, নদী বাঁধ তৈরি করতে স্থানীয় লোকের দরকার হয় না। জেসিবি মেশিনে সব মাটি কাটা হয়। ধান কাটা মেসিনও সুন্দরবনের গ্রামে এসে গেছে। এও তো রকম অটোমেশনের প্রভাব। গ্রামে বেকার যুবকদের কাজ নেই। ফলে বাইরে কাজের জন্য চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে অথবা জঙ্গলে বাঘ কুমীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দু'তিন জন মিলে কাঁকড়া ধরতে অথবা মধু কাটতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে। আগের মত দলবদ্ধভাবে বাদাবনে না যাওয়ায় বিপদ বাড়ছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে জীবন জীবিকার এভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়েছে। আবার বিশ্বত্রাস করোনার মত অতিমারির প্রভাবে পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। করোনার প্রকোপ কমলে আবার তারা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে কাজের সন্ধানে ফিরে গিয়েছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবে সুন্দরবনের অধিবাবাসীদের দীর্ঘদিনের বংশ পরম্পপরায় বয়ে চলা নিজস্ব লোকসংস্কৃতি দারুণভাবে ক্ষতি হয়। বিশেষ ধরনের বালাগান, বালাকি গাজন, নামসংকীর্ত্তন, জেলে মৌলেদের লোকদেবতা বনবিবি, দক্ষিণরায়, গাজিপিরের পূজা হাজোত, পালাগান, লোকযাত্রা, জঙ্গল যাওয়ার আগের লোকাচার, বন্য জীবজন্তু বশীভুত করার মন্ত্রতন্ত্র জ্বালান, খিলেন, চালান; সবই বিলুপ্ত হতে চলেছে। বর্তমান প্রজন্ম আর এসব বিষয়ে আগ্রহী নয়। সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের ভয়ানক এক প্রভাব পড়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

চেনা মুর্শিদাবাদে অচেনা ভোট

মজিবুর রহমান

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুর কেন্দ্রের ভোট শেষ হয়েছে। এমন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন মুর্শিদাবাদ জেলায় বহুদিন দেখা যায়নি। গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে বেশ কিছুদিন ধরে মারধর, খুনোখুনি, লুটপাট নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার প্রায় দু'মাস ধরে এই জেলায় ভোটের প্রচার চললেও কোনো উল্লেখযোগ্য হিংসার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি। মানুষ নিজের ভোট নিজে দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন ভাবে ভোট প্রদানের আহ্বান জানালেও তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। পরিযায়ী শ্রমিকরা ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি ফেরেননি। তবে এর মধ্যেও ভোটের হারের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম আর মুর্শিদাবাদ জেলা রাজ্যের মধ্যে প্রথম দিকে অবস্থান করছে।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে ১৩ লক্ষ (৮১ শতাংশ) ভোট পোল হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খলিলুর রহমান ৫ লাখ ৬২ হাজার (৪৩ শতাংশ) ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। বিজেপি ৩ লাখ ১৭ হাজার (২৪ শতাংশ) ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। ভোটের ব্যবধান ছিল ২ লাখ ৪৫ হাজার। জাতীয় কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) আলাদা ভাবে লড়ে। তাদের মিলিত ভোটের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার (২৬ শতাংশ)। ২০২১ সালে জঙ্গিপুর লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই সামগ্রিকভাবে ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়লাভ করেন।

বাম-কংগ্রেসের মিলিত ভোটের পার্সেন্টেজ ১০ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একটু খারাপ ফল করে এবং ছ'টি পঞ্চায়েত সমিতির দখল নেয়। লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড গঠন করে বাম-কংগ্রেসে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৩ লক্ষের (৭৩ শতাংশ) মতো ভোট পড়েছে। পুরুষ ভোটের তুলনায় মহিলা ভোট বেশি পোল হয়েছে।তৃণমূল কংগ্রেস পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনের মতো দাপট দেখাতে পারেনি। শতাংশের বিচারে তাদের ভোট নিশ্চিতভাবেই কমবে। বিজেপির ভোট আর বাড়বে না। তবে বাম-কংগ্রেসের জোটের বাড়বে। তারা ২-১টি বিধানসভা এলাকায় লিড পাবে। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মোটামুটি ৭০ শতাংশ মুসলমান ও ৩০ শতাংশ হিন্দু ভোটার। হিন্দু ভোটের তিন-চতুর্থাংশ পাবে বিজেপি। বাকি এক-চতুর্থাংশ টিএমসি ও জোটের মধ্যে ভাগ হবে। মুসলিম ভোটের ৫০ শতাংশ টিএমসি, ৪৫ শতাংশ জোট এবং ৫ শতাংশ আই এস এফ, এস ডি পি আই সহ অন্যান্য নির্দল প্রার্থীরা পাবেন। জেন্ডারের দিক থেকে দেখলে টিএমসি বাম-কংগ্রেসের ও বিজেপির থেকে মহিলা ভোট অনেক বেশি পাবে। সামগ্রিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস, জোট ও বিজেপি প্রার্থী যথাক্রমে মোটামুটি ৩৫, ৩০ ও ২৫ শতাংশ এবং অন্যান্যরা ১০ শতাংশ ভোট পেতে পারে। হার-জিতের মার্জিন ৫০ হাজারের বেশি হবে না।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী সাংসদ তথা এবারেরও প্রার্থী আবু তাহের খান পান ৬ লক্ষ ৪ হাজার ভোট। বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেস পৃথক ভাবে লড়েছিল। তাদের মিলিত ভোটের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার। বিজেপি পেয়েছিল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ভোট। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই এলাকার আসনগুলোর একটি বিজেপি ও ছ'টি জেতে টিএমসি। টিএমসি ও বিজেপির ভোট বেড়ে হয় যথাক্রমে ৭ লাখ ৭৫ হাজার ও ২ লাখ ৮৪ হাজার। বাম-কংগ্রেসের ভোট কমে হয় ৪ লাখ ১৮ হাজার।

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশ্য তৃণমূলের একাধিপত্য দেখা যায়নি এবং বাম-কংগ্রেসের জোটের রাজনৈতিক শক্তি ও ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে মুসলিম ও হিন্দু ভোট যথাক্রমে ৮০ ও ২০ শতাংশ।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এক-দুইয়ের লড়াইয়ে থাকবে না, তৃতীয় স্থান নিয়েই তাদের খুশি থাকতে হবে। বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী সিপিএম-এর

Scanned with OKEN Scanner

রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ভোটের প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সিপিএম-এর সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দিনরাত খেটেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাকর্মীরাও সেলিম সাহেবকে ভালো ভাবে গ্রহণ করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী সেলিম সাহেবের সঙ্গে একাধিক সভায় বক্তৃতা করে জান বাজি রেখে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রচণ্ড আগ্রহ, উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা সহকারে জোটের সক্রিয় সমর্থকরা ভগবানগোলা থেকে করিমপুর চষে বেড়িয়েছেন। অনেককেই বলতে শোনা গেছে, সেলিম সাহেব একজন যোগ্য লোক, তাঁর সংসদে যাওয়া উচিত। অন্যদিকে আবু তাহের খানের প্রচারে তেমন ঝাঁঝ দেখা যায়নি। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সহানুভূতি পাওয়ার বদলে মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছে। দ্বিমুখী লড়াইয়ে মহম্মদ সেলিমের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী আঞ্জু বেগম জয়লাভ করবেন বলে মনে হয়।

বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে অধীররঞ্জন চৌধুরী ১৯৯৯ সাল থেকে সাংসদ। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি ৫০ শতাংশ ভোট পান এবং ৩ লাখ ৫৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। ২০১৯ সালে সেই ব্যবধান কমে হয় ৮০ হাজার আর ভোট পার্সেন্টেজ ছিল ৪৫। তিনি সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে বহরমপুর, কান্দি ও বড়ঞায় লিড পান আর রেজিনগর, বেলডাঙা, নওদা ও ভরতপুরে তাঁর ডেফিসিট ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের দখলে যায় ছয়টি আসন। বহরমপুর আসনটি জেতে বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী মনোজ চক্রবর্তী হন তৃতীয়। এই পরাজয়ের আগে কিন্তু মনোজবাবুর জয়ের হ্যাট্রিক ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে তৃণমূল, বিজেপি ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৪১ হাজার, ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ও ২ লক্ষ ৫ হাজার। অর্থাৎ তৃণমূলের ভোট বিজেপি ও কংগ্রেসের যৌথ ভোটের থেকেও বেশি। ২০২৩ সালের বিধানসভা ও বিভিন্ন পৌরসভার নির্বাচনেও কংগ্রেসের ভোট কিংবা সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য প্রমাণ মেলেনি। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ও হিন্দু ভোট যথাক্রমে ৫৫ ও ৪৫ শতাংশ। বিজেপির প্রার্থী বিশিষ্ট চিকিৎসক নির্মল সাহা। তৃণমূলের প্রার্থী বিশিষ্ট ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির দিক থেকে তিনজনই ‘হেভিওয়েট’। পাঠান ও ডাক্তার সাহার সমর্থনে তাঁদের দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বারবার প্রচারে এসেছেন। কিন্তু অধীর চৌধুরীর সমর্থনে কংগ্রেসের কোনো বড় নেতাকে প্রচারে আসতে দেখা যায়নি। হাতের কাছেই সিপিএম-এর মহম্মদ সেলিম ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও বোধহয় ডাকা হয়নি। অধীর চৌধুরী নিজের মতো করে দু’একজন স্থানীয় নেতা নিয়ে প্রচার সেরেছেন। অধীরবাবু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। তিনি নিজেকে ‘একাই একশো’ মনে করেন। ব্যক্তিগত ক্যারিশমার জোরে ভোটে জেতার কথা ভাবতে ভালোবাসেন। ভোটের পাটিগণিতে অধীরবাবুর জেতার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তাঁর জেতার জন্য ভোটের রসায়ন দরকার ছিল।

এই রসায়ন অনুযায়ী গত পাঁচ বছর ধরে যারা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছিল তাদের অর্ধেক আর তৃণমূলকে যারা ভোট দিচ্ছিল তাদের এক-তৃতীয়াংশ যদি এবার অধীরবাবুকে ভোট দেন তবেই তিনি জিততে পারেন। এতো ভোট একজন ব্যক্তির জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুইং করানো সাধারণভাবে খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে অধিকাংশ জায়গাতেই বিজেপি ও তৃণমূলের আঞ্চলিক বা বুথ স্তরের নেতাকর্মীদের অন্তর্ঘাত করতে হবে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? তাঁর ‘রবিনহুড’ হওয়ার পর্বে যারা তাঁর পাশে ছিল তাদের অনেকেই এখন তৃণমূল কংগ্রেসে। তবে জেলার বিরাট সংখ্যক মানুষ এটাও মনে করেন যে অধীরবাবু সাংসদ হিসেবে অতীব দক্ষ ও সক্রিয়। এই ভূমিকা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরা কেউই পালন করতে পারবেন না।

Scanned with OKEN Scanner

মুক্তি পেল গণতন্ত্রের দুই কণ্ঠস্বর

অমিতাভ সিংহ

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর দায়ের করা ভীমা কোরেগাও মামলায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন আগেই জামিন পেয়েছেন। একই সঙ্গে সংবাদ পোর্টাল 'নিউজ ক্লিক'-এর প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থকে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করে বন্দী করাকে বেআইনি ঘোষনা করে তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট।

গত ৩১ ডিসেম্বর ,২০১৭ সালে এলগার পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত কোরেগাও লড়াইয়ের দ্বিশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সভায় আরএসএসের নেতৃত্বে যে হামলা হয় তাতে দুজনের মৃত্যু ও ৩৫ জন আহত হন। ওই মামলায় ৩০০ জন গ্রেপ্তার হন। মহারাষ্ট্র পুলিশ বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, অধ্যাপক, কবি, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি ভারভারা রাও, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি এন সাইবাবা, আইনজীবী ও শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সুধা ভরদ্বাজ, ফৌজদারি আইনজীবী অরুন ফেরেরা, শিক্ষাবিদ ও শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ভার্নন গঞ্জালভেস, ম্যানেজমেন্ট শিক্ষক আনন্দ তেলতুম্বে, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী গৌতম নওলাখা, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের সভানেত্রী সোমা সেন, অধ্যাপক হানিবাবু, ধর্ম প্রচারক স্ট্যান স্মিথ প্রমুখ।

পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত ৮৪ বছরের বৃদ্ধ স্ট্যান স্বামী ২০২১ সালের ৫ জুলাই জেলে প্রয়াত হয়েছেন। অশীতিপর অসুস্থ কবি ভারভারা রাওয়ের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চক্রান্তের অভিযোগে ২০১৮ সালের ২৮ আগস্ট হায়দ্রাবাদের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কম্পিউটারে পেগাসাস স্পাই সফ্টওয়ার ব্যবহারের মিথ্যা অভিযোগ আনাহয়। বোম্বাই হাই কোর্ট তাঁকে ছ'মাসের জামিন দেয়। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থায়ী জামিন হয়। সুধা ভরদ্বাজ জামিন পান ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর। ভার্নন গঞ্জালভেস ও অরুন ফেরেরা সুপ্রীম কোর্টে জামিন পান ২০২৩ সালের ২৭ জুলাই। ২০১৮ সালের ৮ জুন অধ্যাপক সোমা সেন, সুধীর ধাওয়ালা, মহেশ রাউত, সুরেন্দ্র গ্যাডলিং ও রোনা উইলসনকে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করে ফ্যাসিস্ত সরকার। অধ্যাপক সেন জামিন পেয়েছেন গত গত ৬ এপ্রিল।

গত ৫ মার্চ ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ও পোলিওতে আক্রান্ত পাঁচ বছর বয়স থেকে হুইল চেয়ারে অভ্যস্ত অধ্যাপক জি এন সাইবাবাকে জেলে হুইল চেয়ারও দেওয়া হয়নি। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টির সময় পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয়নি। হৃদরোগ, কিডনী ও অগ্ন্যাশয়ের রোগে আক্রান্ত এই মানুষটির চাকরীও চলে যায়। গত ৫ মার্চ তিনি জামিন পান। অবশেষে গত ১৪ মে সুপ্রীম কোর্টে গৃহবন্দি দশা (একটি গ্রন্থাগারে তাঁকে রাখা হয়েছিল) থেকে মুক্তি পেলেন সাংবাদিক ও সমাজকর্মী গৌতম নওলাখা। বোম্বে হাইকোর্ট থেকে আগেই জামিন পেলেও এনআইএ বা জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সুপ্রীম কোর্টে যায়। সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বোম্বে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। ভীমা কোরেগাও মামলায় বিজেপি সরকার নিছক প্রতিহিংসার বসে সমাজের এতজন বিশিষ্ট মানুষকে জেলে বন্দী করে রেখেছিল।

গত ১৫ মে মুক্তি পান সংবাদ পোর্টাল নিউজ ক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ। ইউএপিএ মামলায় গত ১৭ অগাস্ট দিল্লি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে করা এফআইআর প্রকাশ্যে আপলোড করা হয়নি, তার কপিও তাঁকে দেওয়া হয়নি। কি কারণে এই গ্রেপ্তারি তাও তাঁকে লিখিতভাবে জানানো হয়নি। এরকম একাধিক অনিয়ম এই মামলায় দেখা গিয়েছে। আদালতের মতে আইনের গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে এই মামলায়। বিচারপতি মেহেতার মতে 'পুরো ব্যাপারটি যেমন চুপিচুপি করা হয়েছিল সেটা আইনি প্রক্রিয়াকে ধোঁকা দেওয়ার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিসের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানার অধিকার সংবিধানের ২২(১) নং অনুচ্ছেদে লেখা আছে।'

তৃতীয় ও চতুর্থ দফার ভোটের গতিপ্রকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন : লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটে ব্যাপক হারের সম্ভাবনার পর, তৃতীয় পর্ব বিজেপির জন্য আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। বিজেপি প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে একটি নির্ণায়ক লিড পাওয়ার আশা করেছিল, কিন্তু সেই আশা ভেস্তে গেছে, এবং পরিবর্তে বিজেপি বুঝতে পারছে তারা এক বিপদজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে।

লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে ১২ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৯৫ টি লোকসভা আসনের জন্য ৭ মে ভোট হয়। গুজরাটের ২৫ টি আসন ছাড়াও কর্ণাটকের ১৪ টি, মহারাষ্ট্রের ১১ টি, উত্তর প্রদেশের ১০ টি, মধ্যপ্রদেশের ৯ টি, ছত্তিশগড়ে ৭ টি, বিহারের ৫ টি, আসামের ৪ টি, পশ্চিমবঙ্গের ৪ টি আসনে ভোট হয়। দাদরা ও নগর হাভেলিতে ২, গোয়ায় ২ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ১ টি আসনে ভোট হয়।

তৃতীয় দফায় যে ৯৫ টি আসনের ভোট হয়, বর্তমানে বিজেপি জোট তার ৮২ টি আসন দখল করে আছে। এই খানে বিজেপি জোটের লিড বাড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। তৃতীয় দফার আসনগুলিতে, গুজরাটের ২৬টির মধ্যে ২৬ টি, মধ্যপ্রদেশে ৯টির মধ্যে ৯টি, বিহারে ৫টির মধ্যে ৫ টি, ছত্তিশগড়ে ৭টির মধ্যে ৬ টি, কর্ণাটকে ১৪ টির মধ্যে ১৪ টি, মহারাষ্ট্রে ১১ টির মধ্যে ৯ টি এবং উত্তর প্রদেশে ১০ টির মধ্যে ৮টি আসন বিজেপির দখলে রয়েছে।
তৃতীয় পর্বের গ্রাউন্ড রিপোর্টের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে ,তৃতীয় পর্বের ৯৫ টি আসনের মধ্যে, বিজেপি জোট কেবল ১৯ টি আসনে শক্তিশালী।কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে বিজেপি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। তৃতীয় দফার ৯৫ টি আসনের মধ্যে ৬২ টি আসনে কংগ্রেস জোট বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।
আঞ্চলিক দল এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তৃতীয় পর্বে ১৪ টি আসন পর্যন্ত জয়ী হতে পারে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে খারাপভাবে হেরে গিয়ে বিজেপি তৃতীয় পর্বের জন্য যথারীতি তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করে চলেছে। তাতে অবশ্য কোনও কাজ হয়নি।

চতুর্থ দফার ভোটের পর বিজেপি শিবিরে নীরবতা, ক্ষমতায় ফেরা এখন প্রায় অসম্ভব।

১৩ মে লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোট হল। ১৯ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত, তিনটি ধাপে ২৮৫ টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। চতুর্থ ধাপেল ১০ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (UT) জুড়ে ৯৬ টি আসনে ভোট হল। মোট ৩৯১ টি আসন।।

লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ ধাপে, অন্ধ্র প্রদেশের সব কটি (২৫ টি) আসনে , বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে ৫ টি, ঝাড়খণ্ডের ১৪ টি আসনের মধ্যে ৪ টি, মধ্যপ্রদেশের ২৯ টি আসনের মধ্যে ৮ টি, মহারাষ্ট্রে ৪৮ টি আসনের মধ্যে ১১টি , ওড়িশার ২১ টি আসনের মধ্যে ৪ টি, তেলেঙ্গানার সব কটি (১৭ টি) আসনে , উত্তর প্রদেশের ৮০ টি আসনের মধ্যে ১৩ টি, পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে ৮ টি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ১ টি আসনে ভোট হয়েছে।

২০১৯ সালের নির্বাচনে এই চতুর্থ ধাপের ৯৬ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৪৩ টি আসনে জিতেছিল।কিন্তু এই দফায় দক্ষিণ ভারতে ৪২ টির মধ্যে বিজেপির আসন মাত্র ৪টি (অন্ধ্র প্রদেশে ০ ও তেলেঙ্গানায় ৪)।

উত্তরপ্রদেশে চতুর্থ দফায় যে ১৩ টি আসনে ভোট হল, ২০১৯-এ বিজেপি ওই ১৩ টি আসনেই জিতেছিল। মধ্যপ্রদেশেও যে ৮টি আসনে ভোট হল সেগুলো বিজেপির দখলে।

বিহারে চতুর্থ পর্বে যে ৫ টি আসনে ভোট হল, ২০১৯ সালে বিজেপি জোট ৫ টি আসনেই জয়ী হয়েছিল। ঝাড়খণ্ডে, যে ৪ টি আসনে ভোট হয়েছে তার ৩ টি আসন বিজেপির দখলে।

প্রাথমিক তিন দফায় বিজেপির খারাপ পারফরম্যান্সের পরে, চতুর্থ পর্বেও বিজেপির সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই বলে মনে হচ্ছে। যেহেতু চতুর্থ পর্বে বিজেপির জোটের দখলে বেশির ভাগ আসন, তাই হারানো ভূমি কভার করতে বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।
সূত্রের মতে, চতুর্থ পর্বে বিজেপির আসন পূর্ববর্তী ফলাফলের তুলনায় ১৬ থেকে ১৮ আসনে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে , যখন ইন্ডিয়া জোট এই পর্বে খুব ভাল পারফরম্যান্স করছে বলে জানা গেছে।
চতুর্থ দফায় বিজেপির ভোটের শতাংশে সম্ভাব্য হ্রাসের (৮

Scanned with OKEN Scanner

থেকে ৯ শতাংশ) দিকে তাকিয়ে, চতুর্থ দফার ভোটে ৯৬ টি আসনের মধ্যে ৮০ টিতে বিজেপি পরাজয়ের মুখোমুখি হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে চতুর্থ দফার ভোটের পরে, নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির ক্ষমতায় ফিরে আসার কোনও সুযোগ থাকছে না। চতুর্থ দফার ভোট দেশের পরিবর্তনের কাহিনী লিখছে।

ইসরায়েল-বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ বিশ্বব্যাপী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অধ্যাপকরাও সামিল সেই বিক্ষোভে। তাদের সামলাতে পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইসরায়েলের দখলদারির অবসান চান তাঁরা। প্রায় ৬০ বছর আগে সিভিল রাইটস মুভমেন্টের সমর্থনে ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছিল আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো। এতদিন আবার ছাত্রছাত্রীদের সেই রাগি চেহারা দেখছে আমেরিকার প্রশাসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে প্রথম ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভ ব্রিটেন এবং ইউরোপের বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি লেবানন এবং আমাদের দেশেও পৌঁছেছে।

৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি ইসরায়েলিদের হামলায় গাজা উপত্যকায় নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলিদের হত্যাকাণ্ড ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত আড়াই হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাফায় ইসরায়েলি হামলা নিয়ে বিশ্বব্যাপী নিন্দা হচ্ছে। এই বিক্ষোভ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার' প্রতিবাদে অনশন শুরু করেছেন কিছু শিক্ষার্থী। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসির প্রায় ১৪০টি কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়েছে। সপ্তাহ খানেক আগে, কলাম্বিয়ায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকে ১০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে। গাজায় নিহত ছয় বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি মেয়ের স্মরণে বিক্ষোভকারীরা হ্যামিল্টন হল দখল করে নেওয়ায় পরে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে বলে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, 'সম্পত্তি ধ্বংস করা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ নয়; এটা আইনের পরিপন্থী'। বাইডেন বলেন, 'ঘৃণামূলক বক্তব্য বা হিংসার কোনো স্থান নেই, তা সে ইহুদিবিদ্বেষ, ইসলামোফোবিয়া বা আরব আমেরিকান বা ফিলিস্তিনি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যই হোক না কেন।' এরপর থেকে আমেরিকার আন্তত ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদ শিবির তৈরি করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ছড়িয়ে পনেছে ছাত্রদের আন্দোলন।

ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি এবং স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছোট ছোট বিক্ষোভ হয়েছে, যদিও বেশিরভাগই পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয়েছে আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সিটি হল এবং পাবলিক প্রসিকিউটরদের অনুরোধে দাঙ্গা পুলিশ একটি শিবির সরিয়ে দেয়। তারা বিক্ষোভকারীদের তৈরি প্যালেট এবং সাইকেল দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড সরাতে একটি জেসিবি ব্যবহার করে। তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠিও ব্যবহার করে এবং যে ১২৫ জন ছাত্র চলে যেতে অস্বীকার করেছিল তাদের গ্রেপ্তার করে। তবে তাদের অধিকাংশকেই কয়েক ঘণ্টা পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও গাজার যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলোর শেয়ার, পণ্য বা অন্যান্য বিনিয়োগ বিক্রি করে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা যুদ্ধবিরতি, গাজার পরিস্থিতিকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি এবং গাজার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংসের নিন্দা জানানোর আহ্বান জানিয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী গাজা সম্পর্কে তাদের দাবিকে জলবায়ু সংকটের সাথে যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন ইউনিভার্সিটি গত সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে যে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ, কর্পোরেশন, অক্টোবরে একটি বৈঠকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়ে ভোটাভুটি করবে। বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্যাম্প খালি করে দেয়। ইলিনয়ের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং ওয়াশিংটনের অলিম্পিয়ার এভারগ্রিন স্টেট কলেজও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছেছে। আন্দোলনের জেরে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করেছে।

Scanned with OKEN Scanner